জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৫, সংখ্যা-১
জানুয়ারি-জুন ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: https://doi.org/10.3329/jnujarts.v15i1.86832
Page: 26-38

নজরুলের লোকসুরের গান : একটি পর্যালোচনা

মো. মাহমুদুল হাসান*

Abstract

Bengal's folk music is a tapestry of rich diversity, with each region contributing unique melodies and lyrics. The origins of these folk songs trace back to the 10th to 12th centuries, notably with the creation of the Charyapads. Over time, these songs evolved into various forms, including Vaishnava Padabali and Shakta compositions reflecting the regions spiritual and cultural milieu. The spectrum of Bengali folk music encompasses genres such as Kirtan, Baaul, Bhatiali, Bhawaiya, Jari, Sari, Kobi Gaan, Murshidi, Marfati, Leto, Gambhira, Jhumur, and Aalkap etc. Each genre offers a distinct narrative and musical style, capturing the essence of the Bengal's cultural heritage. Kazi Nazrul Islam made significant contributions to Bengali music by composing songs across nearly all these folk genres. Born in 1899 in Churulia, Bengal, Nazrul's upbringing amidst a rich tapestry of folk traditions deeply influenced his musical compositions. His proximity to regions where Santals and traditional Jhumur songs were prevalent left an indelible mark on his work. Nazrul's innovative approach led to the creation of Nazrul Geeti, a genre that melded revolutionary fervor with spiritual, philosophical, and romantic themes. His songs, numbering nearly 4,000, continue to inspire and influence Bengali music, underscoring his unparalleled role in enriching the region's musical heritage.

মুখ্যশব্দ: নজরুল, লোকসংগীত, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝুমুর

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

সাধারণ মানুষের জীবনাচার, ঐতিহ্যের উপকরণ এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব এসব মিলেই লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর এইসব উপকরণকে উপজীব্য করে যে গান রচিত হয় তাকেই লোকসংগীত বলে। ভিন্ন কথায়, সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে লোকমুখে রচিত, প্রচলিত এবং প্রচারিত যে সংগীত, তাই লোকসংগীত। লোকজীবনের আচার, প্রথা, উৎসব, পার্বণ, গ্রামীণ সমাজের সুখ-দুঃখ-প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, জীবন-দর্শন, লৌকিক দেব-দেবী-মিথ ইত্যাদি বিষয় লোকসংগীতের উপাদান হয়ে থাকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,

> বাংলাদেশের লোকসংগীতের রূপ ও বিষয়গত বৈচিত্র্য সর্বাধিক। প্রধানত বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সহজ সরল রূপই বাংলার সংস্কৃতির জন্মদাতা। বাংলার বিশাল সবুজ তৃণভূমি, কল্লোলিত নদ-নদী, মুক্ত স্বচ্ছন্দ মেঘমালা এবং বৎসরের ছয়টি সুনির্দ্দিষ্ট ঋতু এবং তাদের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ সৌন্দর্য এই দেশের নর-নারীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি করেছে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি বিষয়ই বাঙালী তাই তার গান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে।[১]

বাংলার নানা লোকজ ঐতিহ্যের মধ্যে অন্যতম হলো লোকসংগীত। এদেশ নানা কারণে লোকসংগীতের উর্বর ভূমি। তাই বাঙালির প্রাণের গান হলো লোকসংগীত। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) লোকসংগীতের নানা ধারায় বিচরণ করেছেন। তিনি একাধারে বাউল, কীর্তন, মুর্শিদি, মারফতি, সাওঁতালি, জারি, সারি, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালিসহ আরও অনেক লোকধারার গান লিখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নজরুলের এই সংগীত ধারাতে লোকসংগীতের বিভিন্ন সুর পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের জন্মস্থান বর্ধমানে লোকগানের বেশ প্রচলন ছিল। ফলে এই গানের রীতি নজরুলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাই নজরুল নানা ধারার লোকগান রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রায় চার শতাধিক লোকাঙ্গের গান রচনা করেন।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য এবং সংগীতের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর পদচারণা ঘটেনি। এই বহুমাত্রিক প্রতিভাধর মাত্র ২১-২২ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি তাঁর সংগীত নিয়ে এতটাই আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'জনসাহিত্য' সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন,

> সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। ...সংগীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।[২]

কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি গান রচনা করেছেন। রশিদুন্ নবী সম্পাদিত 'নজরুল-সংগীত সংগ্রহ'[৩] তৃতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণে, ৩১৭৪টি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া আরও কিছু কিছু গানের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। "নজরুল রচিত লোকসংগীতের ভাব ও আঙ্গিক-নির্ভর গান প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাধিক।"[৪] তিনি যে লোক-আঙ্গিকের অসংখ্য গান সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির অনুসন্ধানই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা কর্মটি মূলত লোকসংগীতে কাজী নজরুল ইসলামের অবদানের মূল্যায়ন। গবেষণা করতে গিয়ে বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ প্রভৃতি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণাকর্মের তাৎপর্য

নজরুলের লোকসংগীত নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। নজরুল গবেষক নারায়ণ চৌধুরী তার রচিত গ্রন্থ *কাজী নজরুলের গান*–এ লোকগানের আলোচনা করতে গিয়ে কেবল বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, ছাদপেটানোর গানের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক রশিদুন্ নবীও তাঁর লিখিত গ্রন্থ *নজরুল সংগীতের নানা অনুষঙ্গ*–য় কেবলমাত্র লেটো, ঝুমুর, ঝাঁপান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল এবং কাজরি গানের বর্ণনা করেছেন। তবে নজরুলের যে লোক অঙ্গের আরও অসংখ্য গানের ভাণ্ডার রয়েছে; যেমন- কবি গান, সাঁওতালি গান, বেদের গান বা ঝাঁপান গান, ছাদ পেটানোর গান, চাষা বা কৃষাণের গান, ধীবরের গান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের লেখায় উঠে আসেনি। মায়া রায়কৃত *নজরুল সংগীতের বৈচিত্র্য ও বিপন্নতা* গ্রন্থেও নজরুল রচিত লোক-অঙ্গের গানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা দেখতে পাই না। কাজেই বলা যায় যে, নজরুলের লোক-অঙ্গের গানের যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নজরুলের লোক-অঙ্গের গান

কাজী নজরুল ইসলামের ন্যায় এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগীত রচনা করে বাংলা গানে অবদান রেখেছেন; এমন গীতিকবি বিরল। বাংলা গানের অন্যান্য ধারার পাশাপাশি লোক অঙ্গের গানে রয়েছে তার অসামান্য অবদান। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার লোক অঙ্গের গান ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকধারার গানের সুর অবলম্বনে অসংখ্য গান রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. অনুপ ঘোষাল তাঁর *নজরুল গীতির রূপ ও রসানুভূতি* গ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলার লোকসংগীত ছাড়াও অন্যান্য প্রাদেশিক লোকসংগীতের বিভিন্ন শাখার যেমন 'কাজরী', 'চৈতি', 'লাওনি' ইত্যাদির প্রাণবন্ত সুর অবলম্বনেও নজরুল ইসলাম বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংগীত সংগঠন করে গেছেন।"[৫] আমরা জানি যে, ঝুলন, চৈতি, কাজরি, হোরি ইত্যাদি গীতশৈলী উপশাস্ত্রীয় সংগীত হিসেবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলি যেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত হিসেবে প্রচলিত এবং কাজী নজরুল এই ধারার গানের সুর অবলম্বনে অসংখ্য গান রচনা করেছেন; সেই কারণে এই গানগুলিকে আলোচ্য প্রবন্ধে নজরুলের লোক অঙ্গের গানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নিম্নে নজরুল-রচিত বিচিত্রধারার লোকাঙ্গের গান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

লেটো গান

'লেটো' মূলত এক প্রকার হাস্যরসাত্মক গান যাকে নৃত্য ও অভিনয় সম্বলিত পালা গান বলা যায়। "উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাঢ় বাংলার শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী মুসলিম সমাজে 'লেটো' গানের উদ্ভব হয়েছিল।"[৬] লেটো প্রসঙ্গে ড. হারাধন দত্ত বলেন, "লেটো গান সম্ভবত নাটক শব্দের অপভ্রংশ, নাটকীয় ভঙ্গিতে গীতিমাধ্যমে বিষয় পরিবেশনের কারণে গড়ে উঠেছিল। তরজা জাতীয়, দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেয়, উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক এই গানে হাস্যকৌতুক ও রহস্য প্রায় সমগৌরবে

শোভা পায়। লেটো কোনো রিচুয়াল গান নয়, ধর্মাচারবর্জিত প্রমোদরস-পরিবেশনই এর উদ্দেশ্য।"[৭] এই গানে সমকালীন ঘটনা, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি বিষয়াবলি স্থান পায়। নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা। এই অঞ্চলে অনেক মুসলিম পরিবারও বাস করত। মুসলিম পাড়ায় বসত পুঁথিপাঠ, নানারকম কিচ্ছা-কাহিনির আসর অন্যদিকে হিন্দু পাড়ায় চলত কীর্তন, মনসার গান, চণ্ডীপাঁচালি ইত্যাদি। এইসব উৎসব নজরুলকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। নজরুল বাল্যকাল থেকেই চুরুলিয়ায় লেটোগান শুনতে যেতেন। তার কাকা বজলে করিমের একটি লেটো গানের দলও ছিল। ফলে এই গানের প্রেরণা পান তিনি সেখান থেকেই। "নিমশা গ্রামের লেটো দলের ওস্তাদ কাকা বজলে করিম মারা গেলে নজরুল সে দলের সর্ব বিষয়েই হাল ধরলেন যোগ্যতার সঙ্গে।"[৮] নজরুল লেটো দলের জন্য অনেকগুলি পালা রচনা করেন যার মধ্যে কয়েকটি পালা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি হলো- শকুনি বধ, রাজপুত্র, দাতাকর্ণ, চাষার সঙ, মেঘনাদ বদ, আকবর বাদশা, কবি কালিদাস, ঠগপুরের সঙ এবং যুধিষ্ঠির ইত্যাদি। নজরুল চার শতাধিক লেটো গান রচনা করেন।[৯] নিম্নে কিছু লেটোগানের উল্লেখ করা হলো-

১। চাষ কর হে দেহ-জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে',
রোজাতে জমি 'সামালে',
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে ভবেতে!।[১০]

২। সংসার জীবন যাপন করিতে
চাষ কর ভাই বিধি মতে
রবে যদি সুখেতে
এই পৃথিবী মাঝার ॥[১১]

৩। আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই দেখব আজ তোরে
প্রত্যেক বারের পরাজয়ের লাজ নাই অন্তরে ॥
রমণীদের মত হয়ে শুধু সৈন্যদেরই মাঝে
আছিস্ কেন কাপুরুষ বুঝিলাম কাজে,
আর কি রে চাতুরী সাজে মম সমরে ॥[১২]

বাউল

লোকসংগীতের মধ্যে একটি অন্যতম ধারা হলো বাউল গান। বাউলরা প্রচলিত কোনো ধর্মীয় অনুশাসন মানেন না। মানবধর্মই বাউলদের একমাত্র ধর্ম। বাউল সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। বাউলদের ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধনাতে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্বকথা প্রকাশ পায়। বাউল গান সম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম বলেন,

> বাউল গান বাঙালির আধ্যাত্মিক সাধনার গান। রূপকের মাধ্যমে এই গানে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের এক লীলা-সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। প্রাথমিক দিকে বাউল শ্রেণি লৌকিক ধর্মের গোষ্ঠীভুক্ত ছিল– কিন্তু ধীরে ধীরে তারা সংগীত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।[১৩]

নজরুল রচিত কয়েকটি বাউল গান নিম্নরূপ :

১। আমি বাউল হলাম ধূলির পথে
লয়ে তোমার নাম,

আমার একতারাতে বাজে শুধু
তোমারই গান শ্যাম ॥[১৪]

২। আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ,
আমার এ প্রাণের ঠাকুর,
নহে সুদুর অন্তরে মন্দির-গেহ ॥[১৫]

৩। আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুরির মতন
চলছি উড়ে, প্রাণ সই
ছুটছি উর্ধ্বশ্বাসে ঝড় বাতাসে
পড়ব কোথায় কেমনে কই ॥[১৬]

উপর্যুক্ত গানগুলিতে কবি নজরুল তাঁর জীবন দর্শনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুলের বাউল গানে বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদ এবং ইসলাম ধর্মের সুফীবাদের প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

কীর্তন

সাধারণভাবে কীর্তন বলতে আমরা বুঝি, যে গানে স্রষ্টার লীলা, নাম, গুণ ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকে তাই কীর্তন। মূলত রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত যে গান তাকেই কীর্তন বলে। কীর্তন দুই প্রকার– নাম-কীর্তন বা নাম-সংকীর্তন এবং লীলা-কীর্তন বা রস-কীর্তন। আবার অঙ্গগতভাবে কীর্তনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- গরানহাটি, মনোহরসাহী, মন্দারিনী ও রেনেটি। কীর্তন গান বাংলার মানুষের জীবনধারার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। বাল্যকাল থেকেই নজরুল নিজেকে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নজরুল তাঁর ভক্তি পর্যায়ের এই ধারার গানে কীর্তনের সকল বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণতার সাথে। তাঁর রচিত কীর্তনাঙ্গের কিছু গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১। আমি কি সুখে লো গৃহে রবো
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী
ওলো সখী আমিও যোগিনী হবো ॥[১৭]

২। নব কিশলয়-রাঙা শয্যা পাতিয়া
বালিকা কুঁড়ির মালিকা গাঁথিয়া
আমি একেলা জাগি রজনী
বঁধু এলা না তো কই সজনী
আমি বিজনে বসিয়া রচিলাম বৃথা
বনফুল দিয়া ব্যজনী।[১৮]

৩। বাজে মঞ্জিল মঞ্জুল রিনিকি ঝিনি
নীর ভরনে চলে রাধা বিনোদিনী
তার চঞ্চল নয়ন টলে টলমল
যেন দু'টি ঝিনুকে ভরা সাগর জল ॥[১৯]

উল্লিখিত গানসমূহে নজরুল ইসলাম কীর্তনের রূপটি নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভাওয়াইয়া

ভাওয়াইয়া মূলত ভাবপ্রধান গান। ভাওয়াইয়া হলো উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, গোয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার এবং ময়মনসিংহ সংলগ্ন আশেপাশের এলাকার প্রচলিত জনপ্রিয় লোকগান। "অঞ্চলভেদে ভাওয়াইয়া গান বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন চিতান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, দীঘল মাহুতবন্ধুর গান, নাসা ভাওয়াইয়া, করুণ ভাওয়াইয়া, মৈশালভাওয়াইয়া ইত্যাদি।"[২০] এই গানের সাথে গভীর ভাবাবেগ জড়িত। মূলত বিরহ-বেদনা, প্রিয়া বা প্রেয়সীর অপেক্ষার করুণ সুর এই গানের মূল উপজীব্য। নজরুল-রচিত ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ নিম্নরূপ–

১। কুচবরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ,
আমায় লয়ে যাওরে নদী সেই কন্যার দেশ।[২১]

২। নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি ।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি ॥[২২]

৩। পদ্মদীঘির ধারে ধারে ঐ সখি লো কমল-দীঘির পারে।
আমি জল নিতে যাই সকাল সাঁঝে সই,
সখি, ছল ক'রে সে মাছ ধরে, আর, চায় সে বারে বারে ॥[২৩]

ভাটিয়ালি

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের গান হলো ভাটিয়ালি। এই গান মূলত বিরহ, বেদনা এবং নৈরাশ্যের গান। এ ছাড়া, নদী, মাঝি, নৌকা, বৈঠা, পাল, বাদাম, স্রোত, জোয়ার, ভাটা, প্রভৃতি এই গানের উপজীব্য বিষয়বস্তু। সাধারণত মাঝিরা নদীপথে ভাটিতে গমনকালে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। নদী পরিবেষ্টিত বাংলায় ভাঙা-গড়ার সঙ্গে মাঝিরা কখনো কখনো তাল রাখতে পারে না। আর এরকম সময়ে নদীর বুকে নৌকা চালাতে চালাতে আপন মনে মাঝি গেয়ে ওঠে এই ভাটিয়ালি গান। ১৯৩৬ সালে কবি চট্টগ্রামের সন্দীপে বেড়াতে যান। সেখানে মাঝিদের মুখে অনেক গান শুনেই মূলত তিনি ভাটিয়ালি গান লেখার প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য-সংখ্যক ভাটিয়ালি গান রয়েছে। যেমন–

১। পদ্মার ঢেউরে
মোর শুন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা যারে
এই পদ্মে ছিল রে যা'র রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে।[২৪]

২। আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে
বলিস ননদীরে সই বলিস ননদীরে।[২৫]

৩। কুচবরণ কন্যারে তোর মেঘ বরণ কেশ।
আমায় নিয়ে যাওরে নদী সেই কন্যার দেশ।[২৬]

ঝুমুর

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বিহারের (বাঁকুড়া, বীরভুম, সিংভুম, মালভুম, বীরভুম, নাগপুর) সীমান্তবর্তী সাঁওতাল পরগনা এলাকার অধিবাসী সাঁওতালদের গীত ও প্রচলিত গানই মূলত ঝুমুর। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিই হলো এই গানের প্রেক্ষাপট। তবে মাদলের তালে তালে ঝুমুর গানে সাঁওতালদের জীবন কথাও ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাদের যৌথ জীবন যাত্রা, দৈনন্দিন জীবনের প্রেম, প্রীতি, উৎসব, সুখ, দুঃখ, অভাব, অনটন সবই হলো ঝুমুর গানের উপজীব্য বিষয়। নজরুলের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি ঝুমুর গানের সঙ্গে শৈশব হতেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ কিছু ঝুমুর গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ঝুমুর গানগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। নজরুল রচিত কিছু ঝুমুর গান নিম্নরূপ–

১। আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে চেয়ে।
আমায় চেয়ে দেখিস না তাই রূপ গরবীর মেয়ে ॥[২৭]

২। রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে, বাজে বাঁশের বাঁশি।
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো, মন লাগে না কাজে লো
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হলো উদাসী লো ।[২৮]

৩। চোখ গেল 'চোখ গেল' কেন ডাকিস রে
'চোখ গেল' পাখি (রে)
তোর ও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে
চোখ গেল পাখি (রে) ॥[২৯]

ঝুলন

ঝুলন শব্দের অর্থ ঝুল বা দোলন। শ্রীকৃষ্ণের দোলনা উৎসবে এই ঝুলন গীত পরিবেশিত হতো। বলা যায়, ঝুলন লীলায় যে গান পরিবেশিত হতো তাকে ঝুলন গান বলা হতো। প্রকৃতির সৌন্দর্যের অপরূপ চিত্র ঝুলন গানে প্রকাশ পায়। নজরুল ঝুলন পর্যায়ের গান রচনা করে বাংলা গানকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছেন। নজরুল রচিত কয়েকটি ঝুলন গান নিম্নরূপ–

১। এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা।
সুনীল শাড়ি পরো ব্রজনারী পরো নব নীপ-মালা অতুলনা ॥[৩০]

২। সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া ॥[৩১]

৩। দোলে বন তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর
চাহে দুঁহু দোহার মুখপানে চন্দ্র ও চকোর,
যেন চন্দ্র ও চকোর প্রেম-আবেশে বিভোর ॥[৩২]

মারফতি গান

'মারফত' শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। এই গানে মূলত আল্লাহর গুণকীর্তন করা হয়। নজরুলের মারফতি শ্রেণির একটি গান হলো-

১। আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে
ফলবে ফসল, বেচব তারে কিয়ামতের হাটে ॥[৩৩]

মুর্শিদি গান

মুর্শিদ অর্থ হলো 'গুরু'। তাই মুর্শিদি গানকে গুরুবাদী ধর্মীয় সংগীত বলা যায়। নজরুলের মুর্শিদি গানের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো–

১। দুখের সাহারা পার হয়ে আমি চলেছি কাবার পানে ।
পড়িব নামাজ মা'রফাতের আরফাত ময়দানে ॥[৩৪]

২। তোমার নামে একি নেশা হে প্রিয় হযরত।
যত চাহি তত কাঁদি মেটে না হসরত ॥[৩৫]

ঝাঁপান/বেদের গান

সাপের খেলা দেখানোর সময় দেবী মনসা এবং বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি নিয়ে বেদেরা যে গান গেয়ে থাকে তাকেই ঝাঁপান গান বলা হয়। সাপের দেবী মনসার মাহাত্ম্য, চাঁদ সওদাগর এবং বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে ঝাঁপান গান রচিত হয়। বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বেদে সম্প্রদায়ের কৃষ্টি এবং জীবন প্রবাহ অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই বেদে-বেদেনীর গানই হলো ঝাঁপান গান। "মনসা পূজা উপলক্ষে সর্পবিদদের বাৎসরিক পুনর্মিলনকেও অনেকে ঝাঁপান গান বলে আখ্যায়িত করেছেন।"[৩৬]

কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঝাঁপান গান রচনা করেছেন। যেমন:

১। সাপুড়িয়া রে, বাজাও বাজাও সাপ-খেলানোর বাঁশি।
কালি দহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ রে
কাল-নাগিনী নাচে বাহিরে আসি।[৩৭]

২। বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়, আয়, আয়
ধাতিনা ধাতিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশিতে পরান মাতায় ॥[৩৮]

৩। 'কলার মান্দাস বানিয়ে দাও গো, শ্বশুর সওদাগর।
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা-লখিন্দর ॥[৩৯]

সাঁওতালি গান

সাঁওতালি সুরের প্রয়োগ করেও নজরুল গান লিখেছেন। সাঁওতালি সুরের প্রয়োগ করেও বাংলা গানের ভাবকে তিনি এক নতুন মাত্রা দান করেছেন। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে-

১। তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি'
তুমি যে পথ দিয়ে গেছ চলে
তারি ধুলো মাখি হে- একা বসে থাকি ॥[৪০]

কবি গান

নজরুল ইসলামের রচনা থেকে গ্রামবাংলার প্রচলিত কোনো ধারার গানই বাদ পড়েনি। তিনি কবি গানও রচনা করেছেন। কবি গানকে তরজা গানও বলা হয়ে থাকে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই দলের নায়কের কবিতার মাধ্যমে লড়াই হয়ে থাকে। অনেকসময় তাঁরা তাৎক্ষণিক কাব্য রচনা করে আসরে উপস্থিত দর্শক বা শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এই গান বেশ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়। নজরুল ইসলামকৃত 'কবির লড়াই' থেকে দুইটি গানের উদাহরণ দেওয়া হলো-

১। বড় সঙ্কটে পড়েছি মাগো,
দেও মা পদতরী - ত'রে যাই।
তেরো'শো পঁচিশে পৌষ,
গুজরতে খোদ্ খেদু মোড়ল,
সাড়ে সতের আড়ি ধান।[৪১]

২। ওরে নেইকো, ডানা উড়ে এলি সাবাস!
জীবন উড়ে,
[সাবাস! সাবাস! সাবাস!][৪২]

ছাদ পেটানোর গান

ছাদ পেটানোর গান বলতে ছন্দপ্রধান গানকে বোঝায়। কর্মোউদ্দীপনার তালে তালে এই ধরনের গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। নজরুল– রচিত ছাদ পেটানোর গানের একটি উদাহরণ–

১। সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো,
পেট ভরে ভাত পাইনা, ধরো সে হাত গো ॥[৪৩]

কাজী নজরুল ইসলাম গানটি *চৌরঙ্গী* (১৯৪২) চলচ্চিত্রের জন্য রচনা করেছিলেন। গানটি উক্ত চলচ্চিত্রে সমবেতকণ্ঠে গীত হয়।

চাষা/কৃষাণের গান

বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ কৃষাণ। এই কৃষাণের মনোরঞ্জনের জন্য কবি নজরুল গান লিখেছেন। এ গান যেন আজও কৃষাণদের মুখে মুখে গীত হয়ে ফেরে। যেমন–

১। ওঠ্ রে চাষি জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি - ভাল করেই মরব এবার চল্ ॥[৪৪]

২। আমি চাষা এসেছি চাষ করিতে ।
বড় ইচ্ছা, চাষ করিব,এই ভবের জমিতে ॥[৪৫]

৩। মোর মাঠের জমিতে,
লাগিয়েছি বিধিমতে,
ধান হয়েছে ভালো তাতে,
এখন ফসল আলু ডাল ॥[৪৬]

ধীবরের গান

ধীবর শব্দের অর্থ হলো জেলে বা মৎস্যজীবী। জেলেদের জীবন ও কর্ম নিয়ে যে গান রচিত তাই ধীবরের গান। কাজী নজরুল ইসলামি ধীবরের জন্যও গান রচনা করেছেন–

১। জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরবে তাল পুকুরে, জেলো রে ॥[৪৭]

২। ও জেলো তুই গেলি সাগরে
আমি একলা থাকি ঘরে রে।
আমার মনে সুখ নাই রে
ও তুই ঘরে ফিরে আয় রে
ও জেলো তোর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে ॥[৪৮]

চৈতি

বিহার অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রধান ধারাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং অত্যন্ত লোকপ্রিয় গান চৈতি। সাধারণত চৈত্র মাসে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে এই গানকে চৈতি বলা হয়। এই গানে রাম-সীতার ব্যথা ভরা জীবনদর্শন ফুটে ওঠে। চৈতি অঙ্গের গানের মধ্যে একটি হলো–

১। প'রো প'রো চৈতালি সাঁঝে কুস্‌মি শাড়ি।
আজি তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি ॥[৪৯]

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ছাড়াও ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন গানের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলাভাষায় গান রচনা করেন।

কাজরি

কাজরি উত্তর প্রদেশের অন্যতম লোকসংগীত হলেও কাশি এবং মির্জাপুর অঞ্চলেও বেশ প্রচলিত। কাজলী দেবীকে উপলক্ষ করে এই গান গাওয়া হয় বলে একে কাজলী বা কাজরি বলা হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসের তৃতীয়া তিথিতে কাজলী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে রমণীরা নববস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সারারাতব্যাপী কাজরি গান পরিবেশন করে থাকেন। এই ধরনের গানে একজন প্রধান গায়কের সাথে একাধিক সহশিল্পী বা দলগত দোহার থাকে। যারা প্রধান গায়কের ব্যক্ত কথাকে সুরে সুরে সমর্থন দেন। তাই বলা যায়, এই গান মূলত মূল গায়ককে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়। এই গানের বিষয়বস্তু হলো বিরহ-মিলন। এই দিনে ভাইদের হাতে রাখিও বাঁধা হয়। কাজরি গান পরিবেশনার রীতি অনেকটা বাংলার কীর্তনের মতো। নজরুল বেশকিছু কাজরি গান রচনা করেছেন। যেমন–

১। শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না
বরসা ফুরায়ে গেল আশা তবু গেল না ॥[৫০]

২। কাজরি গাহিয়া চল গোপ ললনা।
শ্রাবণ-গগনে দোলে মেঘ-দোলনা ॥[৫১]

৩। এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে
হায় রহি রহি সেই মুখ পড়িছে মনে ॥[৫২]

হোরি

হোরি গান বলতে আমরা রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান বুঝি। রাধা-কৃষ্ণের লীলাই মূলত এই গানের মুল উপজীব্য। দোল উৎসবে রঙ খেলাকে কেন্দ্র করে এই গান পরিবেশন করা হয়ে থাকে। শৃঙ্গার রসাত্মক এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। নজরুল রচিত হোরির গানের মধ্যে দুইটি গানের উল্লেখ করা হলো–

১। আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি ॥[৫৩]

২। আজকে দোলের হিন্দোলায়
আয় তোরা কে দিবি দোল ॥[৫৪]

লাওনি

লাওনি হলো উত্তর ভারতের আঞ্চলিক গান। কাজী নজরুল ইসলাম আঞ্চলিক লোকজ প্রভাব যুক্ত করেই লাওনি গান রচনা করেছেন। এই ধারার গানে তিনি লাওনির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার পাশাপাশি বাংলা গানের কাব্যরস অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এ পর্যায়ের গানের দুইটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

১। পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়
গলিয়া সুরের তুষার
গীত-নির্ঝর বয়ে যায় ॥[৫৫]

২। আমি যেদিন রইবো নাগো লইব চির বিদায়
চিরতরে স্মৃতি আমার জানি মুছে যাবে হায় ॥[৫৬]

উপরিউক্ত লোক অঙ্গের ধারা ছাড়াও হাস্য ও ব্যঙ্গগীতি, বিভিন্ন ধারার কর্মগীতি (যেমন– শ্রমিকের গান, সাম্পানের গান, বিয়ের গান, ঘর জামাইয়ের গান, মধুয়ালের গান, মুচির গান)-র গানও নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন।

উপসংহার

নদীমাতৃক বাংলা এবং এর সুশীতল ছায়াঘেরা প্রান্তর, মাঝি-মাল্লা, বাংলার প্রকৃতি প্রভৃতি নজরুলকে পল্লিসুর সৃষ্টিতে আকৃষ্ট করে তোলে। আর সেকারণেই তিনি লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য গান। বলাবাহুল্য, তাঁর সৃষ্ট লোকগানসমূহ বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে অকৃত্রিমভাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (ইন্ডিয়া: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ২০০৫), পৃ. ৯২
২. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, *অষ্টম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, আগস্ট ২০০৮), পৃ. ২৮
৩. রশিদুন্ নবী (সম্পাদিত), *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকা: কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারি ২০১৯)
৪. রশিদুন্ নবী, *নজরুলসংগীতের নানা অনুষঙ্গ* (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী ২০১৯), পৃ. ৯৯
৫. ড. অনুপ ঘোষাল, *নজরুলগীতির রূপ ও রসানুভূতি* (কোলকাতা: নাথ পাবলিশিং, ২০০৯), পৃ. ৩৫
৬. রশিদুন্ নবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৭. ড. হারাধন দত্ত, *কবি ও মানুষ কাজী নজরুল* (কোলকাতা: বাংলা প্রকাশনী ১৯৯৮), পৃ. ৮০
৮. ড. অনুপ ঘোষাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
৯. রশিদুন্ নবী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০
১০. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
১১. তদেব, পৃ. ৮৪৩
১২. তদেব, পৃ. ৭৭৩
১৩. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর: পরিচিতি ও পঠন পাঠন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৬৬২
১৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬২
১৫. তদেব, পৃ. ৬৬৩

১৬. তদেব, পৃ. ৬৬২
১৭. তদেব, পৃ. ২৭৩
১৮. তদেব, পৃ. ২৩
১৯. তদেব, পৃ. ২২
২০. প্রবীর সেনগুপ্ত, *বাংলার গান বাংলা গান*, ড. অরুণ সরকার (সম্পাদিত) (উত্তর ২৪ পরগণা: সোমদত্তা সেনগুপ্ত, ২০০৬), পৃ. ১৮৭
২১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩
২২. তদেব, পৃ. ৬৭৪
২৩. তদেব, পৃ. ৬৭৬
২৪. তদেব, পৃ. ১৬
২৫. তদেব, পৃ. ৯৫
২৬. তদেব, পৃ. ৩
২৭. তদেব, পৃ. ৩৯
২৮. তদেব, পৃ. ১৯১
২৯. তদেব, পৃ. ১৩
৩০. তদেব, পৃ. ২৫২
৩১. তদেব, পৃ. ৬৮২
৩২. তদেব, পৃ. ২৬
৩৩. তদেব, পৃ. ১৭১
৩৪. তদেব, পৃ. ১৭৫
৩৫. তদেব, পৃ. ১১৮
৩৬. ড. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, *নজরুলসংগীতে লোকউপাদান* (ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট ২০১৭), পৃ. ২৬০
৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল সংগীতের বিচিত্রধারা*, মোবারক হোসেন খান সম্পাদিত, (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট ২০০৫), পৃ. ৮১
৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
৩৯. তদেব, পৃ. ৬৬৭
৪০. ড. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, *নজরুলসংগীতে লোকউপাদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭
৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২০
৪২. তদেব, পৃ. ৯২১
৪৩. মায়া রায়, *নজরুলের দশ দিগন্ত* (ত্রিপুরা: তীর্থঙ্কর দাস, ২০১৬) পৃ. ৯২
৪৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৩
৪৫. তদেব, পৃ. ৮৪২
৪৬. তদেব, পৃ. ৮৪৪
৪৭. তদেব, পৃ. ৯০৪
৪৮. তদেব, পৃ. ৯০৬
৪৯. তদেব, পৃ. ৪৬০

৫০. তদেব, পৃ. ৮৮
৫১. তদেব, পৃ. ৪০৪
৫২. তদেব, পৃ. ৩৫৬
৫৩. ড. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৫৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৭
৫৫. তদেব, পৃ. ২৭
৫৬. তদেব, পৃ. ৬৫১